যে কথা বলতে হবে

রাশেদ খান মেনন

ছাত্র রাজনীতি দিয়েই ছাত্র অপরাজনীতিকে রুখতে হবে

বুয়েটের মেধাবী ছাত্রী সনির সন্ত্রাসীদের গুলিতে মৃত্যুর ঘটনা বাংলাদেশের ছাত্র রাজনীতিকে আবার কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়েছে। বুয়েটে টেন্ডার নিয়ে সশস্ত্র দ্বন্দ্বে লিপ্ত মস্তানদের ছোড়া গুলিতে সনি নিহত হয়েছে। মৃত্যুর আগের মুহূর্তে সে জানতো না তাকে ঘাতকের গুলিতে মৃত্যুর এই পরিণাম মেনে নিতে হবে। ক্যাম্পাসে সন্ত্রাসী গ্রুপগুলোর গোলাগুলির ঘটনা এমন সাধারণ বিষয়ে পরিণত হয়েছে যে, তা এখন অনেকটা গা সওয়া ব্যাপার। গোলাগুলি শুরু হলে সবাই একটু নিরাপদ জায়গা খুঁজে নেয় মাত্র, যাতে ঐ গোলাগুলির শিকার হতে না হয়। কিন্তু সনির ভাগ্য খারাপ যে; সন্ত্রাসী দুই গ্রুপ গোলাগুলি করতে করতে একে অপরকে তাড়িয়ে নিচ্ছিল। সনিকে এর মাঝে পড়ে এক গ্রুপের কাছ থেকে ছুটে আসা গুলিতে নিহত হতে হলো। পুলিশি তদন্তের খবর পড়ে মনে হচ্ছে, তারা এখনো গোলাগুলির মোটিভ খুঁজে বেড়াচ্ছে। যেন বিষয়টা পরিষ্কার নয়। তাদের দ্বিতীয় তদন্তের বিষয় হলো কোন গ্রুপের গুলিতে সনির মৃত্যু হয়েছে। যেন এই রহস্যের সমাধান করতে পারলে আসল মালকে ধরে তারা ফাঁসিতে ঝোলাতে পারবে। একজন সাধারণ মানুষ পুলিশি তদন্তের এতোকিছু বোঝে না। তারা জেনেছে যে, বুয়েটের টেন্ডার নিয়ে ছাত্র নামধারীদের নেতৃত্বে দুটি সন্ত্রাসী গ্রুপ আগ্নেয়াস্ত্র হাতে নিয়ে লড়াইয়ে লিপ্ত হয়েছিল। সেই গোলাগুলিতে যে-কারো জীবন যেতে পারতো। গুলি কার বন্দুক থেকে এসেছিল সেটা জানার চেয়ে ঐ অস্ত্র কাদের হাতে ছিল সেটা জানাই যথেষ্ট। যার হাতেই থাকুক, ঐ আগ্নেয়াস্ত্র রাখা, বহন করা সবই আইনের চোখে অপরাধ। আর যেখানে একটি মৃত্যু ঘটেছে সেখানে কোনো প্রশ্ন করা লাগে না। এখানে উভয় পক্ষই সনির মৃত্যুর জন্য দায়ী। দায় উভয় পক্ষকেই বহন করতে হবে। এই গ্যাং-এ্যাকশনের জন্য আলাদাভাবে কাউকে চিহ্নিত করার প্রয়োজন নেই। বরং এর মধ্যে দিয়ে কাউকে বাঁচানোর চেষ্টা করা হচ্ছে বলেই মনে করা হতে পারে। ইতিমধ্যে সনির হত্যাকাণ্ডের দায়ে অভিযুক্ত মুকি গ্রুপের নেতা মুকির পক্ষে চট্টগ্রাম বিএনপি বিবৃতি দিয়েছে। টগরের পক্ষে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অথবা অন্য কোনো জেলার সরকারি দলের নেতাকর্মীরা যে বিবৃতি দেবে না সেটা কে বলতে পারে!

সে যাই হোক, সনির হত্যাকাণ্ডের পরিণাম কি হতে পারে তার আভাস পাওয়া যায় পুলিশের ব্যবহারে। বুয়েটে গোলাগুলি যখন ঘটে তখন ডিএমপির নীলক্ষেত থানা থেকে সেখানে যেতে ছিন মিনিট সময় লাগার কথা থাকলেও পুলিশের এক ঘণ্টার উপর সময় লেগেছে বলে বুয়েট ছাত্ররা অভিযোগ করেছে। বুয়েটের ছাত্রদের অভিযোগ যে, ঐ সন্ত্রাসী গ্রুপের কয়েকজনকে আটক করে রেখে পুলিশকে তাদের গ্রেপ্তারের জন্য দাবি জানালে পুলিশ বরং বিক্ষুব্ধ ছাত্রদের ছত্রভঙ্গ করার জন্য লাঠিচার্জ করতেই অধিক মনোযোগী ছিল। আর সেই সুযোগে একজন বাদে ঐ সন্ত্রাসীরা সবাই পালিয়ে যেতে সুযোগ পায়। এ পর্যন্তই শেষ নয়। সনি হত্যার ঘটনার পর সপ্তাহ পেরিয়ে গেলেও পুলিশ টগর বা মুকিকে গ্রেপ্তার করতে পারেনি। পুলিশ খবর না জানলেও সংবাদপত্রগুলো খবর দিয়েছে, দুজনেই সরকারি দলের কর্তাব্যক্তিদের হেফাজতে রয়েছে। এমনকি সংসদ সদস্যদের হোস্টেলে তাদের জায়গা হয়েছিল। তবে টগর শেষ পর্যন্ত ধরা পড়েছে। নিহত সনির বাবা-মা প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করে তাদের কন্যা হত্যার বিচার দাবি করলে প্রধানমন্ত্রী যদিও খুনিকে গ্রেপ্তার করা হবে বলে তাদের আশ্বস্ত করেছেন, কিন্তু তিনি ঐ খুনের সঙ্গে যাদের নাম উচ্চারিত হয়েছে তাদের নাম উচ্চারণ দূরে থাক, তাদের সম্পর্কে কোনো কথাই বলেননি। এটা সম্ভবত এই কারণে যে, উভয় গ্রুপের নেতারা ছাত্রদলের নেতা বলে পরিচিত। আর যে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সন্ত্রাসী হামলা সম্পর্কে বেফাঁস মন্তব্য করে সন্ত্রাসীদের ব্যাপারে এনপি জোট সরকারের আসল মনোভাবটাই ফাঁস করে দিয়েছেন, তিনি এবার সনির হত্যাকাণ্ডের ব্যাপারে নিশ্চুপ ছিলেন। এবারো তো তিনি বলতেন যে, মুকি অথবা টগরের সন্ত্রাসীরা সনিকে টার্গেট করে গুলি করেনি। সন্ত্রাসীদের বন্দুক থেকে ছুটে আসা গুলি হঠাৎ করেই গায়ে লেগেছে। আর কি করা, হায়াত মউত সব আল্লাহর হাতে! এ কারণেই সম্ভবত বিএনপির অন্য নেতারা তাকে চুপ করিয়ে রেখেছিলেন।

কিন্তু প্রধানমন্ত্রী, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অথবা সম্পর্কে কোনো মন্তব্য না করলেও বুয়েট কর্তৃপক্ষ দাবি করেছেন তারা এ ধরনের ঘটনা ঘটার আশঙ্কার কথা পূর্বেই প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে ও স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়কে জানিয়েছিলেন। বুয়েট কর্তৃপক্ষের অভিযোগ, বুয়েটের চ্যান্সেলর প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে এ বিষয়ে কথা বলার জন্য সময়ও চেয়েছিলেন। কিন্তু তাদের সময় দেওয়া হয়নি। প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় বিষয়টি সম্ভবত জেনেই এই সময় দেয়নি। কারণ সে ক্ষেত্রে এ ধরনের ঘটনার জন্য তাদের দায়ী থাকতে হতো। প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, বিশ্ববিদ্যালয় সব জেনেশুনেই এ বিষয়ে নিষ্ক্রিয় ভূমিকা পালন করেছে। এখন দায় এড়াতে চাইলেও এদের প্রত্যেককেই এই ঘটনার দায়িত্ব নিতে হবে।

বরং এখন দায় চেপেছে ছাত্র রাজনীতির ঘাড়ে। যেন ছাত্র রাজনীতির কারণেই এসব ঘটনা ঘটেছে। ইতিমধ্যে এই ঘটনাকে উল্লেখ করে ছাত্র রাজনীতি বন্ধ করার পুরোনো কথা আবার তোলা হয়েছে। তদন্ত কমিটি সে ধরনের সুপারিশও করেছে। সম্পাদকীয় মন্তব্য করা হয়েছে এ ব্যাপারে। 'এ কোন ছাত্র রাজনীতি বলে' গুরুত্বপূর্ণ মন্তব্য প্রতিবেদনও বেরিয়েছে। সাধারণ মানুষ খুব স্বাভাবিকভাবেই এ সকল

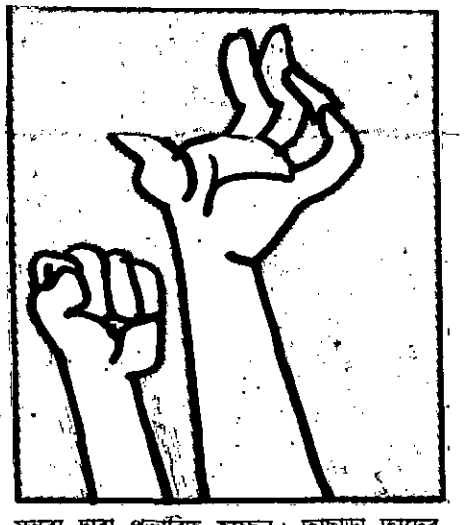

মন্তব্য দ্বারা প্রভাবিত হচ্ছেন। তাছাড়া তাদের প্রতিদিনকার অভিজ্ঞতাও হচ্ছে যে কিভাবে ছাত্র রাজনীতির নাম করে চাঁদাবাজি, টেন্ডারবাজি, মস্তানি, এমনকি হত্যা-ধর্ষণের ঘটনা ঘটছে।

কিন্তু আসলে কি এটা ছাত্র রাজনীতি? ছাত্র রাজনীতির কোনো কারণে, অর্থাৎ ছাত্রদের দাবি-দাওয়া আদায় (এমনকি অন্যায্য দাবিও) বা জাতীয় রাজনীতির কোনো বিষয় নিয়ে এই সংঘর্ষ ঘটেছে? সংবাদপত্রগুলোই হিসাব দিচ্ছে যে, এর প্রায় প্রতিটি ঘটনা ঘটছে টেন্ডার, চাঁদা আদায়, এলাকায় আধিপত্য বজায় রাখাকে কেন্দ্র করে। এসব ঘটনার সঙ্গে শিক্ষা, সাধারণ ছাত্রদের স্বার্থ, এমনকি জাতীয় স্বার্থের সামান্যতম কোনো যোগাযোগ নেই। তা হলে ছাত্র রাজনীতিকে দোষারোপ করা কেন?

ধরে নেওয়া যাক, ছাত্র রাজনীতি বন্ধ করা হলো। তা হলে কি এ ধরনের ঘটনা বন্ধ হবে? ছাত্র সংগঠন বন্ধ করা হলো, তারপর যুব সংগঠনতো থাকবে। নাকি সেটাও বাদ দিতে হবে। হয়তো। তারপর মূল রাজনৈতিক সংগঠনতো থাকবে। এই মূল রাজনৈতিক সংগঠনে কারা থাকছে? এখানেও তো সন্ত্রাস, সন্ত্রাসীরা। আগে রাজনীতি সন্ত্রাসকে নিয়ন্ত্রণ করে। রাজনৈতিক দলের নেতৃত্বের মাপকাঠি এখন আর আদর্শ অথবা রাজনৈতিক-সাংগঠনিক যোগ্যতা নয়। যোগ্যতার মাপকাঠি অর্থ, বিত্ত, পেশিশক্তি। এসবই পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত। ছাত্র রাজনীতি বন্ধ হলে ছাত্রদের দিয়ে লাঠিয়ালি করার বদলে ঐ রাজনৈতিক (?) নেতাদের নিজেদের লাঠিয়াল হতে হবে।

সুতরাং বন্ধ করলে করতে হয় মূল রাজনীতিকে। গণতান্ত্রিক রাজনীতিকে। আসলে এই রাজনীতি বন্ধ করেই এ দেশের ছাত্র-যুব সমাজকে শাসক গোষ্ঠীর লাঠিয়ালে পরিণত করার ষড়যন্ত্র বাস্তবায়িত করা হয়েছিল সেই পাকিস্তান আমলে। পাকিস্তানের সামরিক শাসকরা দেশে রাজনীতি বন্ধ করে দিয়েছিল। অদ্ভুতুড়ে মৌলিক গণতন্ত্র চালু করেছিল। আর তার সমর্থনে ছাত্র সমাজের মধ্য থেকে লাঠিয়াল তৈরি করেছিল। এনএসএফ নামীয় এই ছাত্র লাঠিয়ালরা গভর্নর হাউসের সমর্থন নিয়ে ছাত্র আন্দোলনকারীদের পিটিয়েছে, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকের স্ত্রীকে তুলে নিয়ে গেছে, মেয়েদের কমনরুমে সাপ ছেড়ে দিয়ে মজা দেখেছে, মদ খেয়ে মাতলামি করে বেড়িয়েছে। তাদের কাছে সেই আমলেও পিস্তল ছিল। ছোরা, কিরিচতো বটেই।

> **ছাত্র রাজনীতি সম্পর্কে কথা বললে ঐ রাজনীতির সম্পর্কে বলা প্রয়োজন। সে সম্পর্কে কথা না বলে ছাত্র রাজনীতির ঘাড়ে দায় রাখা কেন? নিজেদের ওপর আসবে বলে? ঐ টেন্ডারবাজি, মস্তানির ভাগ বন্ধ হয়ে যাবে বলে? রাজনীতিতে চক্রান্ত ও ষড়যন্ত্রের ধারা বন্ধ হয়ে যাবে বলে?**

বাংলাদেশ আমলেও এই রাজনীতিকে বন্ধ করেই ছাত্র রাজনীতিতে ঐ পুরোনো এনএসএফীয় ধারা ঢোকানো হয়েছিল। জিয়া-এরশাদ উভয়ের সামরিক শাসনামলেই সামরিক গোয়েন্দা সংস্থা ছাত্রদের মধ্যে তাদের পক্ষের সংগঠন গড়ে তোলার দায়িত্ব নেয়। ডিজিএফআইর প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে এই ছাত্র সংগঠনসমূহের জন্ম হয়। তবে জিয়ার আমলে তফাত হয়েছিল এখানে যে, স্বাধীনতা-পরবর্তী আওয়ামী দুঃশাসন, বিশেষ করে 'বাকশাল' ব্যবস্থা, গণতান্ত্রিক রাজনীতিতে শূন্যতা ও হতাশা সৃষ্টি করেছিল; তার থেকে ডান ও বামের বহুজনই জিয়ার নবগঠিত দলে যোগ দিয়েছিল। তারা সঙ্গে ছাত্রদেরও নিয়েছিল। এ কারণেই বিএনপির ছাত্রদলে রাজনীতি ও দুর্বৃত্তপনার এক সংমিশ্রণ দেখা যায়। রাজনীতির দুর্বৃত্তায়ন ও দুর্নীতিয়ায়নের সঙ্গে সঙ্গে ঐ ছাত্র সংগঠনেও একই ধরনের মেটামরফসিস ঘটেছে।

বাংলাদেশের স্বাধীনতার পর ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগও ছাত্র আন্দোলনকে তাদের ক্ষমতার স্বার্থে ব্যবহার করা শুরু করে। স্বাধীনতার অব্যবহিত পরপরই আওয়ামী দুঃশাসন ও দুর্নীতির বিরুদ্ধে যে যুব বিদ্রোহ ঘটে ধরনের ব্যবহার শুরু হয়। (স্মরণ করুন ডাকসু নির্বাচনে ব্যালট বাক্স ছিনতাই, সেভেন মার্ডার, রক্ষীবাহিনীর সহায়তাকারী ভূমিকা)।

আশির দশকের সামরিক শাসন বিরোধী ছাত্র আন্দোলন, নব্বইয়ের গণঅভ্যুত্থানে এরশাদের সশস্ত্র ছাত্র সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে সর্বদলীয় ছাত্র ঐক্যের নেতৃত্বে খালি হাতে সাধারণ ছাত্রদের ভূমিকা এবং সর্বোপরি গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রবর্তনে ছাত্রদের ভূমিকা এদেশের ছাত্র আন্দোলন ও ছাত্র রাজনীতিকে আবার পূর্বের ঐতিহ্যে ফিরিয়ে নিয়ে গিয়েছিল। কিন্তু ইতিমধ্যে রাজনীতি এবং তার ফলে ছাত্র রাজনীতিতেও পচন ধরেছে। আশির দশকের এরশাদবিরোধী গণআন্দোলনের পাশাপাশি ছাত্ররা রাজনীতিকদের মন্ত্রীত্ব ও সামান্য সুবিধার বদলে বিক্রি হয়ে যাওয়া, দলবদল এবং '৮৬-র সামরিক শাসনের নির্বাচনে যোগ দেওয়ার বিশ্বাসঘাতকতাও প্রত্যক্ষ করেছে। ছাত্র আন্দোলনেও নীরু-বাবলু-অভিদের ঘৃণ্য তৎপরতাও ঘটেছে। নব্বইয়ের গণঅভ্যুত্থানে ছাত্র সমাজের ভূমিকা, তিন জোটের ঘোষণা এই অবস্থা থেকেও উদ্ধারের পথ উন্মোচিত করেছিল। কিন্তু মুক্তিযুদ্ধের বিজয়ের মতো নব্বইয়ের গণঅভ্যুত্থানও ক্ষমতার রাজনীতির বিশ্বাসঘাতকতার খপ্পরে পড়ায় দেশের শাসন ব্যবস্থায় পরিবর্তন ঘটানো সম্ভব হয়নি। বরং সামরিক স্বৈরাচারের প্রচলিত রীতি-পদ্ধতি-আচরণেরই পুনরাবৃত্তি ঘটে নতুন রাজনৈতিক ব্যবস্থায়। এমনকি পাকি স্বৈরাচার, পশ্চাদপদ প্রতিক্রিয়াশীল ধারণার সঙ্গে খুব সহজেই আপোস করা হয় ক্ষমতার স্বার্থে। ইতিমধ্যে পৃথিবীতেও পরিবর্তন ঘটেছে। আশির দশকের পুঁজিবাদী আক্রমণ সমাজতন্ত্রের বিপর্যয় ঘটিয়ে নব্বইয়ের মুক্তবাজার অর্থনীতির বিজয়কে সম্পূর্ণ করেছে। মুক্তবাজার অর্থনীতিই আদর্শের ক্ষেত্রে, গণতান্ত্রিক রাজনীতির ক্ষেত্রে চরম ধস নামিয়েছে। রাজনীতির বাণিজ্যায়ন, দুর্বৃত্তায়ন ও দুর্নীতির ধারাকে বিশ্বব্যাপী সম্প্রসারিত করেছে। বাংলাদেশের রাজনীতিতেও এর প্রভাব পড়েছে অতি দ্রুতগতিতে। রাজনীতিতে এখন আদর্শবাদ, নীতিনিষ্ঠতা, জনকল্যাণ, দেশের কল্যাণ কোনো কিছুই কার্যত অবশিষ্ট নেই। গত এক দশকে বাংলাদেশের রাজনীতিতে পরদেশনির্ভরতা, এমনকি, দেশের অভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে অন্যদের সালিস মানা, অর্থ-বিত্ত, সন্ত্রাস ও আত্মোন্নতির যে ধারা সৃষ্টি হয়েছে তার প্রতিফলন ঘটেছে সর্বত্র। সমাজের সর্বাপেক্ষা সংবেদনশীল অংশ হিসেবে ছাত্র সমাজের নিয়ন্ত্রণ করার উপরতলার অভিলাষ রাজনীতির সঙ্গে সঙ্গে ছাত্র রাজনীতিকেও কলুষিত করেছে।

সুতরাং ছাত্র রাজনীতি সম্পর্কে কথা বললে ঐ রাজনীতির সম্পর্কে, বলা প্রয়োজন। সে সম্পর্কে কথা না বলে ছাত্র রাজনীতির ঘাড়ে দায় রাখা কেন? নিজেদের ওপর আসবে বলে? ঐ টেন্ডারবাজি, মস্তানির ভাগ বন্ধ হয়ে যাবে বলে? রাজনীতিতে চক্রান্ত ও ষড়যন্ত্রের ধারা বন্ধ হয়ে যাবে বলে?

ছাত্র রাজনীতিকে বন্ধ করতে না বলে বরং ছাত্রদের বলা উচিত ছাত্র রাজনীতির নামে যারা সন্ত্রাস করছে, টেন্ডারবাজি করছে, চাঁদাবাজি করছে, শিক্ষাঙ্গনকে কলুষিত করছে তাদের রুখে দাঁড়ানোর জন্য, যেমন এই ছাত্ররা রুখে দাঁড়িয়েছিল এনএসএফ-এর বিরুদ্ধে। এনএসএফ-এর মধ্যেও বিদ্রোহ হয়েছিল। নব্বইয়ের গণঅভ্যুত্থানের সময় এরশাদের সশস্ত্র ছাত্রদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছিল সাধারণ ছাত্ররা। প্রশ্ন উঠতে পারে সেই ছাত্র নেতৃত্ব, ছাত্র সংগঠন কি আছে, কারা সে ধরনের প্রতিরোধ গড়ে তুলতে পারে? এখানেও সেই বিকল্পের প্রশ্ন আসছে। ছাত্র অঙ্গনে সেই বিকল্প শক্তির অস্তিত্ব আছে। আর যদি সেটা যথেষ্ট না হয়, তাকে শক্তিশালী করে গড়ে তুলতে হবে। ছাত্র রাজনীতি বন্ধ করার ওকালতি করে নয়, মূল রাজনীতি অপধারা সম্পর্কে চুপ করে থেকে নয়, বরং ছা আন্দোলনের পুরোনো ঐতিহ্যকে স্মরণ করি দিয়ে ছাত্র রাজনীতির গণতান্ত্রিক ও প্রগতিশী ধারা দিয়ে এই ছাত্র অপরাজনীতির ধারা রুখতে হবে। আর এর জন্য প্রয়োজন হবে রাজনীতিরও গণতান্ত্রিক সংস্কার। এ ক্ষেত্রে ছাত্র আন্দোলন ষাট ও আশির দশকের মতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। তাকে সহায়তা করতে হবে, সহযোগিতা করতে হবে। সেই ছাত্র রাজনীতির অভ্যুদয় ঘটুক, অভ্যুত্থান ঘটুক।

রাশেদ খান মেনন : বাংলাদেশের ওয়ার্কার্স